শিক্ষার পরিবেশই নেই, শিক্ষিত জন্মাবে কীভাবে?

শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ভূমিকাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। খাটো করে দেখলে যা হয়, আমাদের দেশের শিক্ষার বেহাল অবস্থা তার বাস্তব প্রমাণ। বলা যায়, এক বৈঠকে যত দেশের নাম মনে আসে, সব দেশের তুলনায় শিক্ষার উন্নয়ন ও মানের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছনে পড়ে গেছি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ অবস্থায়ও আমাদের কোনো গাত্রদাহ হয় না। বরং এ ধরনের লেখালেখিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বিরক্ত হন। আমাদের ছেলে-মেয়েরা এজন্য কোনোভাবেই দায়ী না, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাই এজন্য দায়ী। অথচ দায়ভারটা ছেলে-মেয়ে ও অভিভাবকদের উপরে এসে পড়ে। দেশ পিছিয়ে যায়।

এদেশের শিক্ষানীতির লক্ষ্য অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো সুষ্ঠু পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার অভাব। আমরা ভবিষ্যৎ ভেবে যেমন কাজ করি না, আবার আগেভাগে প্রতিবিধানের চেষ্টাও করি না। অব্যবস্থা ও কর্দমাক্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। আমাদের একটা মানসিক ব্যামো হলো, আমরা আগে বোঝার চেষ্টা করি না, কম পড়লে পরে টের পাই। যারা সিদ্ধান্ত নেন, তারা ফল ভোগ করেন না। ফল ভোগ করেন সাধারণ মানুষ ও দেশ। তখন বিলাপ করা ও পারস্পরিক দোষারোপ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আমরা অনিয়ম, অব্যবস্থা, স্বজনপ্রীতি, সামাজিক-দুর্বৃত্তায়ন, বিকৃত রাজনীতির চিন্তাধারা ও অমানবিক মনোভাবের যাতাকলে চ্যাপটা হয়ে অর্ধেক অঙ্গ নিসাড়-হওয়া ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলা চতুষ্পদের মতো পড়ে পড়ে ধুঁকছি। এদেশে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, 'চোরের মা-র বড় গলা', বিবেকের দংশন নির্লিপ্ত হয়ে গেছে এবং আমরা নির্দিধায় ব্যক্তিস্বার্থ বিবেচনায় তা মেনে নিই। অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, প্রতারণা, মুখে মধু পেটে বিষ, আত্মবিভাজন, পরচর্চা আমাদের পরিবেশকে ক্রমশই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসবই শিক্ষার অভাব। এর জন্য বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থী, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আমরা রাজনৈতিক দলবাজি, অপচিন্তা ও গলাবাজিতে এতই উন্মাদ ও মত্ত হয়ে গেছি যে, ন্যায়-অন্যায় বোধটুটুও হারিয়ে ফেলেছি। প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে তো একটা কথা আছে– তাও বিস্মৃত হয়েছি। এসবের প্রতিফল ও পরিণতি ভেবে দেখার এক মুহূর্তও ফুরসত আমাদের নেই। চারদিকে সুস্থ-সাবলীল চিন্তার চর্চা ও বিকাশ নেই। অন্তত প্রতিদিনের পত্রিকাটা একটু গভীরভাবে পড়লেই আমরা এ জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাযুক্ত, দুর্বিপাক-ভারাক্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। একটা দেশ ও জাতি গড়ার জন্য বায়ান্ন বছর একেবারে কম সময় নয়। বায়ান্নটা বছর আমরা পার করে ফেললাম– এ পরিস্থিতির কোনোক্রমেই উন্নতি হলো না। অথচ একটি সুশিক্ষিত জাতিই কেবল মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম। আমরা মানবসম্পদকে পচিয়ে ফেলেছি, সেখান থেকে শুধুই দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। শিক্ষার উন্নয়ন মানেই মানবসম্পদের উন্নয়ন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বহুমাত্রীক সমস্যায় জর্জরিত, যা আমরা প্রত্যেকে অবগত। আমি পরিসংখ্যান তুলে না ধরে পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার বাস্তব অবস্থা নিয়ে কিছু কথা বলবো।

গত ১২ জুন ২০২৩ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিক্ষার্থীর মানসিক সমস্যার কারণ ইন্টারনেট' শীর্ষক এক জরিপে দেখা যায়, জীবনে কোনো না কোনো সময়ে মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হন ৭২.২ শতাংশ শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ৮৫.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে, তাদের মানসিক সমস্যার পেছনে ইন্টারনেটের ভূমিকা রয়েছে। জরিপ অনুসারে, তরুণ শিক্ষার্থীদের বড় অংশই অফলপ্রসূ কাজে ইন্টারনেটে বেশি সময় ব্যয় করে। ইন্টারনেটে সময়

ব্যয় তাদের স্বাভাবিক জীবনে প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইন্টারনেটে সময় ব্যয় তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ বিঘ্নের জন্য দায়ী। তাদের অনেকেই ইন্টারনেটে পর্নো দেখা, সাইবার ক্রাইম, বাজি ধরা, বুলিং করা প্রভৃতি অপ্রীতিকর কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। ইন্টারনেটে অন্য একাধিক সমীক্ষায় দেখলাম আরো ভয়ঙ্কর চিত্র। ফলাফল এক জায়গায় করলে দেখা যায়, তেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী স্মার্টফোনের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফিতে আশক্ত। কী পিলে-চমকানো তথ্য! উঠতি-বয়সী এ ছেলেমেয়েগুলোর লেখাপড়া আদৌ হয়, কি হয় না? তাদের লেখাপড়ার মান কেমন হয়? তাদের জীবনে উন্নতিই-বা কেমন? এহেন পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ড্রপ-আউট হচ্ছে, কিশোর গ্যাংয়ে শামিল হচ্ছে, জীবন-বিধ্বংসী নেশার আড্ডায় নাম লেখাচ্ছে। পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এপথে যুক্ত হচ্ছে ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যায়ের বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরাই বেশি। তারপর তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ আলো নিভে যাচ্ছে। পরবর্তী জীবন এভাবেই কুঁড়িতে পোকায় খাওয়া অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলের মতো অভিশপ্ত জীবনের কালিমা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এদের অনেকেই উন্নতির পথ খুঁজতে নীতিভ্রষ্ট রাজনীতির তালিম নিচ্ছে। অধিকাংশই সমাজ ও পরিবারের বোঝা ও আপদে রূপ নিচ্ছে। যারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উপরের ক্লাসে উঠছে, তারাও সুস্থ জীবনের ঠিকানা পাচ্ছে না। সার্টিফিকেটসর্বস্ব কর্মহীন-শিক্ষাহীন অবহেলিত এক ভাসমান জনগোষ্ঠী, শিক্ষিত মানবকূলে যাদের নিরাপদ ঠাঁয় নেই। এদেরকে আমি আমার মতো করে নাম দিয়েছি 'মানব আপদ' বলে। বর্তমান সমাজের প্রতিটা জায়গায় এদের প্রাধান্য ও বিচরণ।

প্রতিনিয়ত অনেক ছাত্রছাত্রী, তাদের শিক্ষক, অভিভাবকদের সাথে এ বিষয়ে আমার কথা হয়। আলোচনা থেকে শিক্ষাকার্যক্রমের বাস্তবতা সম্পর্কে অনেককিছুই বুঝতে পারি। অভিভাবকমহল অভিযোগ করেন, 'ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কথামতো চলতে চায় না, স্কুলে শিক্ষকের কথাও নেয় না, তারা মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে গেছে। কেবলমাত্র এলাকার পাতিনেতাদের কথায় এরা সাড়া দেয়। বিস্তৃত সমাজ থেকে তারা প্রতিনিয়ত কুশিক্ষা নিচ্ছে, নীতিকথা ও নৈতিকতার বর্তমান বাজার বড্ড মন্দা'। শিক্ষকরাও অনেক ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার বিষয়ে বিরক্ত হয়ে গেছেন। তারাও আশাহত হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় কি কোনো দেশ ও জাতি সামনে এগোতে পারে? খুব কম ছেলেমেয়েই বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানে, আদেশ-নির্দেশ মেনে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে যারা লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। অথচ যে বিশাল অংশ লেখাপড়া না শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠীত না হতে পেরে সমাজের বোঝা ও সমাজে কলুষতা ছড়ানোর কাজে নিয়োজিত হলো, সমাজে শিক্ষিত মানুষের গণনা থেকে হারিয়ে গেল, তাদের আমরা হিসাবে ধরিনে, আমলে নিইনে। এই যে পোকাধরা নাফোটা ফুলগুলো কিংবা রোগাক্রান্ত অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলগুলো অনুকূল বাতাসে রাজনীতির পাখায় ভর করে থানা ও জেলা পর্যায়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্লোগান হাঁকছে, অপকর্ম করে সমাজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সমাজের নীতিনির্ধারক হয়েছে। সমাজে দুর্নীতি-দুরাচারবৃত্তিসহ অন্যায়, অশালীন হেন কাজ নেই যা তারা করছে না। এরাই আমাদের 'সোনার ছেলে'র ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। এরাই দলেবলে স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজের গভর্নিং বডিতে সসম্মানে বিচরণ করছে। শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতি করছে ও টাকার গন্ধ শুকছে। আমরা প্রতিনিয়ত তাদের গলায় ফুলের মালা পরাচ্ছি। তাদের কথায় সমাজ চলে। তারা স্কুল-কলেজের হেডমাস্টার ও অধ্যক্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বনে গেছে। সে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কি পরিবেশ ঠিক থাকার কথা? না, আদৌ লেখাপড়া হওয়ার কথা?

যারা মানবসম্পদ নিয়ে গবেষণা করছেন, সমাজবিজ্ঞানী, পরিকল্পনাকারী সকলেই নির্বাক। যৎকিঞ্চিত গবেষণার ফলও বাস্তবায়ন হয় না। পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনাও বাস্তবায়নকারীরা আমলে নেন না। দিন পার হয়ে যায়। দেশে রাজনীতির ব্যবসা হালে পানি পায়। আমরা 'বাঙালি জাতিসত্ত্বার উত্তরাধিকার' বলে গর্ববোধ করি।

শিক্ষার মান বিষয়ে একটা গোলটেবিল আলোচনায় গেলাম। একজন বাদে সকল বক্তাই শিক্ষার নিম্নমান অবস্থা ও হালদশার কথা বললেন। করণীয় কি করতে হবে বললেন। বুয়েটের একজন বক্তা বললেন, 'না, আমরা তো ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী পাচ্ছি, এদেশে লেখাপড়ার মান অতটা খারাপ না। বুয়েট থেকে পাশ করে অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাচ্ছে'। বুঝলাম, তিনি একটা বদ্ধ ঘরের ভেতর বসে পুরো দেশের অবস্থাকে দেখছেন। বাস্তব অবস্থা হলো: হাতে গুণে দু-চারটা সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হচ্ছে তাদের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীদেরই আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষা নেওয়ার মতো শিক্ষার ভিত নেই। শিক্ষকরা দায়ে পড়ে, কখনো চাকরি বাঁচাতে তাদেরকে পাশ নম্বর দিয়ে পাশ করাচ্ছেন। এরা লেখাপড়ার ব্যাপারে উদাসীন ও নির্বিকার। লেখাপড়া শেখার কোনো আগ্রহ নেই। রাতদিন ফেসবুক ব্যবহার ও জোড়া বেঁধে গল্প করতে ব্যস্ত। জীবনের সব বয়সের সব চাওয়া-পাওয়া ও ভালোলাগা যে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উপযুক্ত নয়, এমন কি– চোখের সামনের ক্ষুদ্র বুড়ো আঙুল সুদূরের হিমালয়কেও যে ঢেকে দেয়– এ বোধ ও উপলব্ধি তাদের মধ্যে নেই। আমি অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যে ঐ পর্যায়ে লেখাপড়া করার মতো মানসিক পরিপক্কতার অভাব দেখতে পাই। তাদের চিন্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা লোপ পেয়েছে। লেখাপড়ার ভিত্তির মধ্যে মুখস্তকর্ম বেশি, চিন্তাশীলতা ও বাস্তবতা কম বলেই এমনটি হয়েছে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে দৈনিক পত্রিকাটাও পড়ে না। বাংলা-ইংরেজি কোনো ভাষাতেই দখল নেই। ইংরেজি অক্ষর দিয়ে ভুল বাংলা শব্দ লিখে বাক্য তৈরি করে। এ বিষয়গুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আমার সহকর্মীদেরও বলতে শুনেছি।

মূলত শিক্ষামানে ধস নেমেছে প্রাইমারি ও হাইস্কুলগুলোতে। সে-কথা বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ পায়। সেখানে শিক্ষামানের পতনের কোনো জবাবদিহিতা নেই। এতে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি ও মূল্যায়নব্যবস্থার কথা ভেবে হাততালি দেওয়া ও পুলকিত হবার কোনো কারণ নেই। এই এক বছরের মধ্যেই দেখবেন প্রায় সকল ছেলেমেয়েই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বসে আছে। শত শত কোটি টাকা ব্যয়ের নতুন মূল্যায়নব্যবস্থা 'যাহা পূর্বং তাহাই পরং' হয়ে গেছে। দেখবেন, 'নামেই তালপুকুর, কিন্তু ঘাটে ঘটি ডোবে না'। এসব শুভঙ্করের ফাঁকি এদেশের সচেতনমহল ভালো বোঝে। কারণ চাকরি বাঁচাতে কিংবা শিক্ষক হিসেবে কৃতিত্ব নিতে শুধু উপরের ঘরে টিক দিলেই হয়ে যায়, শিক্ষকের তো আর ব্যক্তিগত জমি বন্ধক রাখতে হয় না! এজন্য শিক্ষক জাত শিক্ষক না হলে এবং জবাবদিহিতা না থাকলে যা হবার তা-ই হবে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আছে, তা আশাপ্রদ নয়। সেখানে 'গমও উদা, জাতাও ঢিলা'। একটা দেশের মানবসম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে সেখান থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া অনেক কঠিন। সেজন্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় আইনকানুন তৈরি, আইনের বাস্তবায়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এ বিষয়ে তো আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রেই অনিহ এবং দুর্নীতিতে আগেভাগেই মোটামুটি চ্যাম্পিয়ন হয়ে বসে আছি। ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে বেশি বেশি নম্বর দিয়ে রাখা, দায়িত্বে অবহেলা করে আলাদাভাবে সুবিধা নেওয়া, এগুলোও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে। এদেশের সকল বিভাগের দুর্নীতির লাগাম আলগা করে দিয়ে একমাত্র শিক্ষা বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করার বাসনা কতটুকু সফল হওয়া উচিত, প্রতিটা ভাবুক লোকই তা বোঝেন। সেজন্য শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি নিয়ে আমি খুব একটা ভাবাবেগতাড়িত হই

না, যেমনি অতীতে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা চালু করাতে পরিণতি নিয়ে যা ভেবেছিলাম তা-ই হয়েছে; সেজন্য বরং বলি, 'সিইং ইজ বিলিভিং'।

ইউজিসি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক আইনকানুন তৈরি করে ফেলেছে। বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়গুলোতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষামানের কী দশা? এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা করে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া, না-কি জনগোষ্ঠীকে জীবনমুখী, কর্মমুখী ও মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলা? উদ্দেশ্য আমরা কতটুকুই-বা হাসিল করতে পারছি? স্বার্থকতার কোনো ইভ্যালুয়েশন আছে কী? আমাদের সকল মহৎ উদ্দেশ্য ও অর্জন তো 'নীতিভ্রষ্ট রাজনীতি' নামের 'বিষাক্ত গুটি পোকা'য় নিরবধি কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। শিক্ষাকার্যক্রমের হালহকিকত স্বল্পকথায় বলে তিয়াষ মেটার কথা না। এটাও একটা 'হাজার রাতের কেচ্ছা' হতে পারে। সংশ্লিষ্টমহলের হুঁশ যত তাড়াতাড়ি ফেরে এ জনগোষ্ঠীর মুশকিল ততই আসান হয়।

(২২ জুন ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।